তিনপাহাড়

(জিওলজিকাল এক্সকার্সন ১৯৬০)

আমার প্রথম ভ্রমণ তিনপাহাড়-রাজমহলে। প্রথম পাহাড়ে চড়া তিনপাহাড়ে। এ ঘটনা ষষ্ঠ দশকের শেষে ডিসেম্বর মাসে। আমরা তখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র। কলেজ থেকে জিয়োলজিকাল এক্সকার্সনের জন্য বেরনো হয়েছি।

প্রথম বেড়ানোর আনন্দ চিরকালই অবিস্মরনীয়। ডায়রিতে লিখে রেখেছিলাম টুকরো টুকরো কিছু কথা।

সাধারণ বিবেচনায় মনে হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে এসে স্টেশনে পৌঁছে বসে থাকার কোন মানে হয় না। তবু ঘন্টা দেড়েক সময় হাতে নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে হাজির হয়েছিলাম প্রবল উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে। ছোট ব্যাগের মধ্যে খুদে টর্চ ছুরি হ্যামার, লেন্স ইত্যাদি উপকরণ নিয়েছি। পঁয়ষট্টি জনের দল। কলেজের এক্সকার্সনে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পাঁচ নম্বর প -টফর্মে হাজির হয়েছে অজয়দা আর জনাকয়েক সহপাঠী। আমাদের কামরা রিজার্ভ করা। জানলার পাশের আসন দখল করে নিচে নেমে দাঁড়ালুম। একে একে বন্ধুরা এসে গেল। সব্যসাচী দাশগুপ্তর ফ্লাস্কে জল ভরে নিলাম। শিশিরের ঘড়িটা যেন আর এগোতেই চায় না। এখনো সাড়ে নটা বাজল না?

আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ল খুব ধীরগতিতে। বালি ব্রিজ অবধি এমনি যাবে কূর্মগতিতে। বেয়াক্কেলে মন ডানা মেলে ওড়ার জন্য আকুল। দ(ণেশ্বের ছাড়িয়ে তারপর গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

'ভল্যুমদা' একগুচ্ছ রহস্য আর সিনেমা পত্রিকা নিয়ে এসেছে। মাদকরসের উপভোগ্য বিলিব্যবস্থা। বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগ আর কতদূরে! স্টেশন থেকে চা খাওয়া হল। ধ্রুব মিহিদানার স্বাদ চাখতে দিল। শ্রীমান সনৎ ওদিককার কুপে খুব রসালো পরিবেশ তৈরি করেছে। খেউড় মেশানো গানের প্যারডি।

বালার পুরো নাম বিশ্বনাথন সরস্বতী — ঘুমের মধ্যে আয়েশ করে বিশ্বরূপ দর্শনে মশগুল। মাখন-আশিষের চেষ্টাও অবহেলা করার নয়। মাঝে মাঝে আমিও তন্দ্রার আবেশে ঝুঁকে পড়ছিলাম। তারপরেই সজাগ হচ্ছি, না ঘুমনো চলবে না।

পথের দৃশ্য ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। বাইরে ঘন অন্ধকার তবু টর্চের আলো ফেলে চলমান দৃশ্য দেখার ছেলেমানুষি কিছুতেই বর্জন করা যাবে না।

বোলপুরের মুগ্ধতা ভেঙে খানখান হল বাইরে থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধে। বোলপুর মানে তো বিশ্বকবি আর ফুলের সুবাস! সেখানে এমন দুর্গন্ধ থাকবে কেন?

একটু পরে ত্রিদিব আর নিভাষ ওঝা তাস খেলতে বসে গেল। পুরুলিয়ার হুটমুরা থেকে নিভাষ এসেছে কলকাতায় পড়তে। আমি আর নরেশ পালরায় বাংকে উঠলাম — একটু আধশোয়া বিশ্রাম নেব। নিচের তাকে মাখন আর আশিষ ভটচার্য। বাকিরা সাহেব-বিবি-গোলামের ছলচাতুরী দেখতে ঘিরে রইল পরিবেশ।

ঘুম আসে আবার চলে যায়। তার থেকে ট্রেনের দুলকি চালে দোল খেতে খেতে আর গানের কলি আউড়ে যেতে অনেক বেশি মজা। অন্ধকার হালকা হতে টের পেলাম বাংলাদেশের শ্যামলিমা উধাও। রুখু পাথর আর উঁচু উঁচু ঢিবি ছড়ানো চারদিকে।

অজয়দা এসে জানিয়ে গেলেন — পরের স্টেশন তিনপাহাড়।

টর্চের আলোয় মনে হচ্ছে আমরা পাহাড়ের কাছাকাছি রয়েছি।

তিনপাহাড় স্টেশনে নেমে পড়লাম ভোরবেলায়। ঘড়িতে ছটা বাজে। অদূরে বিপুলায়তন তিনটি পাহাড় আমাদের চোখে ঘোর বিস্ময় সৃষ্টি করে বিরাজমান। তিন পাহাড়ের শীর্ষত্রয়ীর আড়ালে পূবের আকাশে নবজাতকের রক্তি(মাভা। আরেকটু পরে পাহাড়ের খাঁজ দেখে লাফিয়ে আকাশমার্গী হল সূর্য।

আমাদের গন্তব্যস্থল রাজমহল। ছোট ট্রেন ধরে যেতে হবে। ছোট বলতে সাধারণের জন্য গোটা তিনচারখানি কামরা মাত্র। আর মালপত্রের জন্য গোটা তিনেক বগি।

সকলে বলছিল রাজমহল সাত মাইল দূরে। আমাদের মনে হল অন্তত দশবারো মাইল দূরে হবে। গাড়িতে উঠে দেখি মাছের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার যোগাড়। কোনরকমে রুমাল নাকে চেপে বসে রইলাম।

রাজমহল একেবারে গংগার পাশে। স্টেশন পেরিয়ে বাজার তারপরই নদী। ওয়েটিং হলে মালপত্র রেখে গোছগাছ করে নিলাম। হাতে রইল হাতুড়ি আর পকেটে পেনসিল-নোটবুক। সকালের জলখাবার সারা হল চা-পাঁউরুটি দিয়ে।

এরপর ভূতাত্ত্বিক পর্যটনে অগ্রসর হওয়া। ইতিমধ্যে এক ছুটে দেখে এসেছি গংগার প্রশস্ত প্রবাহ। দূরের ডিংগি নৌকো যেন স্বপ্ন-মাখা চিত্রপট। আকাংখার সাড়া জাগায়। সামনে গোটাকয়েক নৌকো-বজরা ঘাটে বাঁধা। মাছ কেনাবেচা চলছে। খানকতন দোকানঘর আছে। দরিদ্র কিছু কুটির। দূরে একফালি বিস্তীর্ণ চর দেখা যাচ্ছে। অথচ সেখানে একবারও ভিজে পায়ে দাঁড়ানো যাবে না এটাই ভারী কষ্টের।

জিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান এস-কে-সি (সুনীল স্যর) চারদলে ভাগ করে দিলেন আমাদের। চারদিকে তারা ছড়িয়ে পড়বে। আমি রইলাম সুনীল স্যরের দলে।

আমাদের উপদলটা রেলপথ ধরে এগুতে লাগল। নতুন করে উচ্ছ্বাস পেয়ে বসছে। ধূলোমাটির বুকে নতুন জুতোয় শহুরে পদচিহ্ন এঁকে এঁকে আমরা এগোচ্ছি। পথ চলতি লোকজনের সংগে কথা বলে বলে এগোতে হচ্ছে। এক জায়গায় রাস্তা দুভাগ হয়ে গেল। রাস্তা বলতে খেতখামার চিরে মেঠোপথ। অল্প দূরে গিয়ে মেঠোপথ ছেড়ে চওড়া পথে উঠলাম।

রাস্তা নয় যেন ধূলোর নদী। গাছের পাতা আর সবুজ নেই। ধূসর মিহি লালচে ধূলোয় রঙিন। প্যান্টের ঝুল কমিয়ে ফেলেও রেহাই নেই। সামনে পিছনে প্রত্যেক পদক্ষেপে ধূলোর গোলা উড়িয়ে এগিয়ে চলা। আর কতদূরে যেতে হবে? পায়ে ব্যথা ধরে গেল যে। সবার আগে কে যাচ্ছে ঠাহর হচ্ছে না। তারপর আরো দুজন। তৃতীয় সারিতে সমর রায় আর নিশীথের সংগে আমি। 'চলো কোদাল চালাই' ঢঙে সার দিয়ে অন্যান্যরা আসছে।

সাড়ে এগারোটার পরে গায়ে আর কোট-সোয়েটার বয়ে চলা সম্ভব হল না। প্রখর সূর্যকে কোনভাবেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। বারবার জল খাচ্ছি। দূরে গংগার রূপোলি চর তখন আর তেমন স্বপ্ন-মাখা লাগছে না। তবু যেন সম্মোহিত হবো বলে সম্মোহিত হলাম।

কপাল থেকে ফোয়ারার মতো ঘাম ঝরছে। জামা ভিজে জবজবে। রসনা শুকিয়ে আমসি। কষে-বাঁধা নতুন জুতোয় পাদুটো এখন দেহকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। এদিকে বংগজ বীর সন্তানেরা কাহিল হয়ে বিহারের কোন অখ্যাত প্রদেশের ধূলাস্তীর্ণ রাস্তায় বসে পড়বে সেটা মেনে নিতেও লজ্জা আছে। এতটা সময় লোকজন কি বিস্ময়ে দেখছিল আমাদের! আর এখন তারা কৃপা করবে? চলবে না। মন চাঙা করে দুদ্দাড়িয়ে পা ফেলে চলতে শুরু করলাম নবোদ্যমে।

একজন জানতে চাইল আমরা কোথা থেকে আসছি। পতিতপাবনী গংগার অনুকরণে বললাম — কোলকাতার আশুতোষ কলেজ হইতে।

শেষ অবধি রাজমহল পাহাড়ে পৌঁছনো গেল না। সুনীলস্যরও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পথে পড়ল চায়না ক্লে-র খনি। মাটির নিচে গড়ে-ওঠা চিনামাটির স্তর। সেটাই দেখা হল। স্তরের ঢাল ও ডিপ মাপা হল। সুনীলস্যর কিছু কথা বললেন। তারপর পাছাকাছি কয়েকটা কোয়ারি দেখা হল। আমরা গোটাকয়েক রক কুঁড়িয়ে নিলাম। আকরিক পাথর দেখলাম চেনা-অচেনা নানা রকমের। সকলেই যেন পাকা চোখে

এখানে ওখানে হাতুড়ির ঘা মেরে যাচাই করে দেখছে — এমনই ভাবখানা। বলা যায় না, ভারতবর্ষের কোন অজানা ভূস্তর আমাদের আবিষ্কারের জন্য বসে রয়েছে কি না। একবার আবিষ্কারটা করে ফেলতে পারলেই আর দেখতে হবে না। জিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্মকর্তারা মালা হাতে ছুটে আসবে।

ঘটনা হল রাজমহল না পৌঁছেই রাজমহল-ভ্রমণ সাংগ হল। ফিরে গেলাম স্টেশন চত্বরে। পেটে তখন আগুন জ্বলছে। এখুনি কোন হোটেলে না ঢুকলেই নয়। ভাত ডাল তরকারীর সঙ্গে মাছও জুটল। গংগার টাটকা ইলিশ। তবে ঝোল না গংগার হলুদ-ধোওয়া জল তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। ভাত কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাওয়ার মতো যথেষ্ট বালি-কাঁকরে সমৃদ্ধ। পানীয় জনের জন্য মা গংগাই তো আছেন। দই দেখে লোভ হল। কিন্তু সেকি টক দই রে বাবা, 'ফেলে দে ফেলে দে' জাতের টক।

বেলা তিনটে নাগাদ মাছের গন্ধে ভরপুর সেই ট্রেনে করে আবার রাজমহল থেকে তিনপাহাড় চলে এলুম। হাতে অনেকটা সময় আছে। অনেক রাতে ট্রেন। সামনে পাহাড়, হাতে সময় আছে আর পাহাড়ে চড়বো না, এটা হয় নাকি! ওয়েটিং হলে ব্যাগ রেখে দে ছুট।

সূর্যের তেজ কমেছে। কাঠ-ফাটা রদ্দুর আর নেই। একটু পরেই ওড়না-ঢাকা সন্ধ্যারানি এসে যাবে। তার সঙ্গে রূপোলী চাঁদ। ওরা সরোবরে স্নান করতে যাবে হয়তো। কিন্তু তখন ইন্দ্রদেব রথ হাঁকিয়ে এসে যে সন্ধ্যাকে হরন করে নিয়ে যাবে তাতো নিশ্চিত। সূর্যদেব যতোই রোষান্বিত হোক না কেন, মহাকালের সম্মতি যখন আছে তখন তো অন্য উপায় নেই।

তিনপাহাড়ের তিনটি শীর্ষ একসারে দাঁড়িয়ে আছে। আলগা পাথরে ভর্তি। পা রাখতে গেলে সরসর করে গড়িয়ে যাচ্ছে। বহু কসরত করে পাহাড়ে চড়ছি। কসরত ছাড়া কি পাহাড়ে ওঠার কোন মানে হয়? ন্যাড়া পাহাড় — গাছগাছালি নেই।

খানিকটা সময় পরে সকলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঝকমারি দেখা যাচ্ছে কম নয়। প্রাথমিক উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কেউ কেউ শীর্ষ ছুঁতে চেষ্টা করছে। আমি দুর্বল ও ভীরু পায়ে ওদের অনুসরণ করছিলাম। ছুটে ছুটে না পারি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকবো? মোটেই না।

জয়ন্ত পিছন থেকে চীৎকার করছে — উঠছো তো, নামার সময় দেখো কি হয়!

তাইতো। নামা তো আরো ভয়াবহ। একবার বেকায়দায় পড়লে শুধু নিচের দিকে গড়ানো। পাথরের চাঁই-এর মধ্যে পড়ে তালগোল পাকিয়ে একেবারে নিচে। ইহজীবনে আর উঠতে হবে না দুপায়ে ।

হঠাৎ দেখি সমর রায়, দেবব্রত আর সুখেন্দু বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। দেবব্রতের হাতের মুঠোয় ধরা লম্বা একগুচ্ছ ঘাস। আলগা হলেই আর দেখতে হবে না। একেবারে ধরণীতলে। অনেকটা বেশি খাড়াই পথে ওস্তাদী করতে গিয়েই এমন বিপদ ডেকে আনল। কোনমতে হাতুড়ির সরু দিক গেঁথে গেঁথে অবশেষে ওরা নিচে নামল।

জনাকয়েক পাহাড় শীর্ষে উঠেছিল। আমিও যে তাদের মধ্যে একজন সেটা বেশ গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল দলের মধ্যে। একবার আশিষ পিছলে গেল। হুড়মুড় করে নিচে তখন সে নামছে। অক্লেশে। ভাগ্যিস একটা বড়ো পাথর নাগালে পেল — খাঁজে আটকে প্রাণটা বাঁচল। দুয়েকজন সামান্য চোট পেয়েছে।

তিনপাহাড়ে সূর্যোদয় দেখেছিলাম। সূর্যাস্তও দেখলাম। লাভের মধ্যে বড়ো লাভ হল পাহাড়ে-চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন আর কুড়িয়ে পাওয়া খানকতক কোয়ার্টজ পাথর। বেশ চকচকে দানাদার সাদা পাথর। ঠিক সাদাও নয়, স্বচ্ছ।

রাতে হোটেলে খাওয়া আর গভীর রাতে ট্রেন-ধরা। ভ্রমণ শেষ। তবু কি অফুরন্ত ভালো-লাগায় ভরপুর ভ্রমণ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তিনপাহাড় কেটে ব্যালাস্ট হচ্ছে। পাহাড়ের কিছুটা অংশ ইতিমধ্যে উড়ে গিয়েছে। জানি না আবার যদি কখনো এপথে আসি তিনপাহাড় আর দেখতে পাবো কিনা। সভ্যতার প্রয়োজনে মানুষ ঐ বিশাল অস্তিত্বটাই মুছে ফেলবে হয়তো।